তবুও গনতন্ত্র

ইসলাম ও গনতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা করে ইদানিং প্রায়ই অনেক লেখা দেখা যায়। বিশেষত: ইসলাম বিরোধী সাইটগুলোতে প্রায়শই দাবী করা হয় ইসলামে গনতন্ত্রের ধারনা থাকা দূরে থাক বরং ইসলাম আসলে গনতন্ত্র বিরোধী। ইসলামবিরোধী তথাকথিত কিছু স্বেচ্ছাসেবক তো পৃথিবীর সমস্ত সমস্যা সমাধানের গুরুভার নিজের কাধে তুলে নিয়ে আদাজল খেয়ে লেগেছেন এটা প্রমান করার জন্য যে, 'মধ্যযুগীয় বর্বর আইন কানুন বিশিষ্ট ইসলামে গনতন্ত্রের কোনো ধারনাই আসলে নেই !'

তা না থাকুক। কি আছে সেটা দেখা দরকার। এসব বিষয়ে মুক্ত আলোচনা হওয়া দরকার। দেখা দরকার ইসলামের আইন কানুন গুলো কি সত্যিই বর্বর! এগুলো কি সত্যিই মানবতা বিরোধী! ইসলামে শাসন ব্যাবস্থা কি গনতন্ত্র বিরোধী? শাসকের ইচ্ছা অনিচ্ছাই কি জনগন মানতে বাধ্য?

এসব ব্যাপারে আমার নিজের জ্ঞানও খুব বেশী নেই। তারপরও কথা বলতে চাই। নিজে যা চিন্তা করি তা অন্যদের কাছে পৌছে দিতে চাই। যদি ভুল হয় তবে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।

প্রথমে আসা যাক ইসলামের সাথে গনতন্ত্রের তুলনায়। এ ব্যাপারে মওদূদীর ভাষ্য২,

> *ইসলামে গনতন্ত্র নেই। অবশ্য ইসলামে সরকারের যে পদ্ধতির বর্ননা করা হয়েছে তা গনতন্ত্রের খুবই কাছাকাছি। শরীয়ত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ কাদের উপর ন্যস্ত করা হবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহন করা সাধারন মুসলমানেরদেরই কাজ। সাধারন মুসলমান যতবেশী সচেতন হবে ততই বেশী সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারবে। তাদের সচেতনতা যতই ত্রুটিপূর্ন হবে তাদের সিদ্ধান্ত ততই ত্রুটিপূর্ন হবে। যদি সাধারন মুসলমানদের এই অধিকার অস্বীকার করা হয় তবে এ বিষয়ের ফয়সালা কে করবে এই প্রশ্ন দেখা দেয়। বুদ্ধিজীবিরা ফয়সালা দিবে - একথা বললে আবার প্রশ্ন উঠে বুদ্ধিজীবি কারা এবং কি কারনে? এর সমাধান কি ভাবে করা যাবে?*

যে মূলনীতি গুলো এখান থেকে পাওয়া যায় তা হল:

১। শাসক নির্বাচনের দায়িত্ব সাধারন মানুষের।
২। ইসলামী রাষ্ট্র হবে শরীয়া ভিত্তিক।

প্রথম পয়েন্টটিতো একদম স্পষ্ট। শাসককে জনগন দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে।

এ ব্যাপারে খারেজীদের সাথে ওমর বিন আব্দুল আজীজের বিতর্কটি দেখুনঃ

একদল খারেজী যখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে তখন তিনি বিদ্রোহীদের দলপতিকে লিখেন:

'খুন খারাবী দ্বারা কি লাভ হবে? এসো আমার সাথে আলোচনা করো ; তোমরা সত্যের উপর থাকলে আমি মেনে নেবো, আর আমি সত্যের উপর থাকলে তোমরা মেনে নেবে।'

তারা উত্তর দিল ঃ

‘স্বীকার করি, আপনার খান্দানের অন্যান্য ব্যক্তির চেয়ে আপনার রীতি স্বতন্ত্র। তাদের কার্যকলাপকে আপনি অন্যায় বলে অভিহিত করেন। তবে তারা যখন গুমরাহীর উপর ছিল, তখন আপনি তাদের উপর অভিসম্পাত করেন না কেন?’

হযরত উমর বিন আব্দুল আজীজ জবাব দেন ঃ

‘আমি তাদের কার্যকলাপকে অন্যায় বলে থাকি। তাদের নিন্দা করার জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয়? এরপরও আবার অভিসম্পাত করার কি দরকার? তোমরা ফেরাউনের উপর কতবার অভিসম্পাত করেছো (অর্থাৎ ফেরাউনের উপর অভিশাপ দেয়ার কোনো দরকার আছে কি ?)?’

খারেজীরা এ যুক্তি মেনে নেয়। কিন্তু আরেকজন বলে বসে ঃ

‘একজন ন্যায় পরায়ন ব্যক্তি কি এটা সহ্য করতে পারে যে, তার উত্তরাধিকারী হবে একজন অত্যাচারী ?’

উত্তরে উমর বিন আব্দুল আজীজ নেতিবাচক জবাব দেন ।

সে ব্যক্তি আবারো বলে ঃ

‘আপনি কেমন করে আপনার অবর্তমানে ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালিকের হাতে খেলাফতের দায়িত্ব ন্যস্ত করবেন, অথচ আপনি জানেন যে সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না ?’

তিনি উত্তর দিলেন ঃ

‘আমার পূর্বসূরী তার স্বপক্ষে পূর্বেই বাইয়াত গ্রহন করেছেন। এখন আমি কি করতে পারি?’

খারেযী আবারো প্রশ্ন করে ঃ

‘যে ব্যক্তি ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালিককে আপনার পর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছে, আপনি কি মনে করেন এমনটি করার অধিকার তার ছিলো ? আপনি কি তার এই সিদ্ধান্তকে ন্যয়সংগত বলে মনে করেন ?’

এ প্রশ্নে উমর বিন আবদুল আযীয লা জওয়াব হয়ে যান। বৈঠক ভেঙ্গে যাওয়ার পর তিনি বারবার বলতে থাকেন ঃ

‘ইয়াযীদের ব্যাপারটি আমাকে শেষ করে দিয়েছে। আমার কাছে এ যুক্তির কোনো জবাব নেই। পরওয়ারদেগার। আমাকে ক্ষমা কর।’

উল্লেখ্য উমর বিন আবদুল আজীজ উমাইয়া রাজবংশের শাসক হলেও তিনি ছিলেন নির্বাচিত। শাসক হওয়ার পর তিনি সর্বপ্রথম যে ভাষন দেন তা হল ঃ

‘আমার উপর সরকার পরিচালনার এ দায়িত্ব অর্পন করে আমাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আমি এটা চাইনি। এ ব্যাপারে আমার মতামত গ্রহন করা হয় নি, মুসলমানদের পরামর্শও গ্রহন করা হয় নি। তোমাদের ঘাড়ে

আমার আনুগত্যের যে রজ্জু পরিয়ে দেয়া হয়েছে, আমি নিজে তা খুলে ফেলেছি। এখন যাকে খুশী তোমরা নিজেদের নেতা বানাতে পারো।’
সমবেত জনতা সমস্বরে বলে উঠে, আমরা আপনাকেই চাই। আমরা সকলেই আপনার রাষ্ট্রীয় কতৃত্বে সন্তুষ্ট। জনগনের এ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের পরেই তিনি খেলাফত গ্রহন করেন।[১]

সুতরাং ‘শাসক নির্বাচিত হবে জনগনের দ্বারা’ - এটি ইসলামের একটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হল ঃ ইসলাম কি বহুদলীয় ব্যবস্থা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে ? অভিযোগ উঠেছে ইসলামে নাকি ‘মত প্রকাশের স্বাধীনতা’ নেই যা আছে গনতন্ত্রে। যারা এই অভিযোগ করছেন তাদের জন্য আমি নিচের উদাহরন দিচ্ছি।

আমরা জানি আমাদের দেশে ‘আদালতের রায়’ এর উপর কথা বলা অশোভন। ‘আদালত অবমাননা’ একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। কিন্তু এ ব্যপারে ইমাম আবু হানিফার মত ভিন্ন। আদালতের বিরুদ্ধে তিনি স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতেন। কোনো আদালত ভুল ফয়সালা দান করলে তিনি আইন বা বিধির যে কোনো ভুল স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতেন। তার মতে, আদালতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অর্থ এই নয় যে, আদালতকে ভুল ফয়সালা করতে দেয়া হবে[১]। মত প্রকাশের স্বাধীনতা ইসলামে নাগরিকের অন্যতম অধিকার বলে স্বীকৃত।

মতামতের স্বাধীনতার ব্যপারে ইমাম আবু হানিফা এতটা অগ্রসর ছিলেন যে বৈধ নেতৃত্ব এবং ন্যায়পরায়ন সরকারের বিরুদ্ধেও কেউ যদি কোনো কথা বলে, সমকালীন নেতাকে গালমন্দ দেয়, এমন কি তাকে হত্যার মত প্রকাশও করে, তাহলেও তাকে শাস্তি দান এবং আটক করা তার মতে বৈধ নয় যতক্ষন না সে সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং বিশৃংখলা সৃষ্টির দৃঢ় সংকল্প গ্রহন করে[১]।

তিনি সরকার বিরোধীদের ব্যপারে দলীল হিসেবে খারেজীদের প্রতি হযরত আলী (রা) এর ঘোষনা পত্রটির উল্লেখ করেন। হযরত আলী (রা) খারেজীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদেরকে মসজিদে আসা থেকে বারন করবো না, বিজিত সম্পদ থেকেও নিবৃত করবো না ; যতক্ষন না তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র পন্থা অবলম্বন না কর[১]। উল্লেখ্য খারিজীরা আলী (রা)কে বৈধ খলীফা বলে স্বীকার করত না।

তবে ইসলাম ‘মত প্রকাশের স্বাধীনতা’ দিলেও তা সম্পূর্ন অবাধ নয়। অন্যের চরিত্র হনন মূলক কথা ‘মত প্রকাশের স্বাধীনতা’র মধ্যে পড়ে না। ইসলাম জান ও মালের পাশাপাশি একজন নাগরিকের সম্মানের নিরাপত্তাও করে থাকে। এর ফলে প্রমান ছাড়া কেউ কাউকে যদি ‘ব্যভিচারী’ বলে গালি দেয় তবে তা আইনের আওতায় পড়বে এবং শাস্তি ভোগ করবে।

আপনারা জানেন যে, অধিকার আর দায়িত্ববোধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাধারন মানুষের তো এই অধিকার আছে যে তারা তাদের নেতা নির্বাচন করবে। কিন্তু তাদের দায়িত্ব হচ্ছে তারা তাদেরকেই নিজেদের নেতা বানাবে যারা সৎ, যোগ্য এবং খোদাভীরু। যাদের কর্মপদ্ধতি হবে ইসলামের নীতি নির্ভর বা শরীয়া নির্ভর। যাদের সততা হবে সবার কাছে গ্রহন যোগ্য।

এখন ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি ‘শরীয়া’ নিয়ে আলোচনা করব।

অনেকেরই ধারনা ‘শরীয়া’ আসলে সম্পূর্ন অপরিবর্তনীয় জড় বস্তু সদৃশ। সপ্তক শতকে যে ভাবে যে পদ্ধতিতে শরীয়া প্রয়োগ হয়েছে এখনও সেভাবেই করতে হবে। যুগের দাবী বলে কিছু নেই।

যারা এ দাবী করেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই ঃ হ্যা। শরীয়ার একটি অংশ যার ভিত্তি কোরান ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ - সেই অংশটি অবশ্যই অপরিবর্তনীয়। কিন্তু বাকী অংশ টুকু যার সুস্পষ্ট বিধান কোরান/সুন্নাহ হতে আসে না তা প্রয়োজনে পরিবর্তনের দাবী রাখে যদিও তা বড় বড় আলেম কতৃক সমর্থিত হয়। যেমন হযরত উমর (রাজি আল্লাহু আনহু) কতৃক দেয়া বিভিন্ন বিধানে পরবর্তী কালের ফকীহদের আপত্তি।

আধুনিক প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'মওদূদীর পত্রাবলী' বইতে মওদূদী বলেন ঃ

> *ইসলাম তো কেবল আমাদেরকে মূলনীতি প্রদান করে। এসব মূলনীতি উন্নত দেশ সমূহে প্রয়োগ করার জন্য এক পন্থা এবং উন্নয়নশীল দেশে প্রয়োগ করার জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। ইসলামের মূলনীতি সমূহ বুকে নিয়ে যদি অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে এই দুটি প্রয়োগ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তবে এ দুটি পদ্ধতির মধ্যে অমিল থাকলেও কিছু যায় আসে না। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, এই বৈপরিত্য যেন মূলনীতিতে সৃষ্টি না হয় বরং এটা হতে পারবে কেবল প্রয়োগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে।*

বিষয়টি আরেকটু ব্যাখা করা যাক । যে কোনো পদ্ধতির প্রয়োগে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ন ঃ

১। মূলনীতি, যাকে আমরা গানিতিক ভাষায় বলে থাকি algorithm.
২। প্রয়োগ পদ্ধতি, যাকে বলা হয় implementation.

যে কোনো সাকসেসফুল সিস্টেম ডিজাইন করতে গেলেই চাই algorithm এবং implementation এর যথাযথ সমন্বয়। বাজে algorithm এর implementation থেকে যেমন ভাল performance আশা করা যায় না তেমনি অসাধারন algorithmও ত্রুটিপূর্ন implementation এর কারনে মূল্যহীন হয়ে যায়।

লেটেষ্ট মডেলের BMW গাড়ীও দক্ষ ড্রাইভার ছাড়া ভালো চলে না।

ইসলামের ব্যপারটিও তেমনি। ইসলাম শুধু মূলনীতি গুলো দিয়েছে। প্রয়োগ পদ্ধতি কেমন হবে তা নির্ভর করবে ঐ এলাকার পরিবেশের উপর। শরীয়ার একটি উদ্দেশ্য জনকল্যান। এর ফলে আইনের প্রয়োগও হতে হবে জনকল্যানমূলক ও যুগের চাহিদার সাথে মানানসই।

উদ্ভুত পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের তাগিদে ইসলামের খুটিনাটি বিধিতে প্রয়োজনীয় রদবদল করার অবকাশ রয়েছে। তবে শরীয়া সম্পর্কে গভীর জ্ঞান যারা রাখে তারাই এ ধরনের রদবদল করার অধিকারী হবে[৩]।

এর ফলে সপ্তম শতকে ইমামগন যে পদ্ধতিতে শরীয়ার প্রয়োগ করেছেন এখনও যে হুবহু সেভাবেই করতে হবে তা ঠিক নয় । কিন্তু আশ্চর্যের ব্যপার হচ্ছে অনেক দেশেই ইসলামী আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে তাই করা হচ্ছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই শরীয়া বিদ্বেষীরা একে নারী নির্যাতনের হাতিয়ার বলে প্রচার চালানোর সুযোগ পাচ্ছে (হয়ত তাদের দাবীতে সত্য লুকিয়ে থাকতে পারে)। নিচে একটি উদাহরন দেয়া হল ঃ

http://groups.yahoo.com/group/mukto-mona/message/7501থেকে অংশ বিশেষ তুলে দিচ্ছি ঃ

SHARIA – THE MOST DANGEROUS BOOK IN THE WORLD.

By-fatemolla.

Yes, It is.

Because, this is only Law Book of the world which (A) Punishes the victims, and (B) Applies discriminatory status on the basis of gender and faith. Here are some proofs.

From THE PENAL LAW OF ISLAM, pages -44, 45, 46, 47, 127 & 149: -

1. THE EVIDENCE REQUIRED IN A CASE ADULTERY IS THAT OF FOUR MEN, ……AND THE TESTIMONY OF A WOMAN IN SUCH A CASE IS NOT ADMITTED.

2. THE EVIDENCE OF WOMEN IS ORIGINALLY INADMISSIBLE ON ACCOUNT OF THEIR WEAKNESS OF UNDERSTANDING, THEIR WANT OF MEMORY AND INCAPACITY OF GOVERNING.

3. THE EVIDENCE OF ANY PERSON WHO IS A PROPERTY, THAT IS TO SAY, A SLAVE, MALE OR FEMALE, IS NOT ADMISSIBLE.

4. THE TESTIMONY OF A PERSON THAT HAS BEEN PUNISHED FOR FALSE ACCUACCUSATION IS INADMISSIBLE.

5. AN INFIDEL WHO HAS SUFFERED PUNISHMENT FOR FALSE ACCUSATION, SHOULD AFTERWORDS BECOME A MUSLIM, HIS EVIDENCE IS THEN ADMISSIBLE.

Please ask your conscience, are these laws acceptable?

আমার উত্তর ঃ

এটা সত্য যে ব্যভিচার প্রমানের ক্ষেত্রে আমাদের ইমামগন চূড়ান্ত সতর্কতা গ্রহন করেছিলেন। প্রান হননের মত অপরাধের ক্ষেত্রে এ ধরনের সতর্কতা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। তারা চান নি বিন্দু মাত্র সন্দেহের অবকাশ যেখানে থাকতে পারে সেখানে এই আইন প্রয়োগ হোক। এর ফলে তারা নিজেদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে কিছু শর্ত দিয়ে গেছেন যাতে কোনো অবস্থাতেই এই আইনের অপপ্রয়োগ না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।

এই সতর্কতা থেকেই তারা ব্যভিচারের ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য বাদ দিয়েছেন, বাদ দিয়েছেন দাসের সাক্ষ্য। শত্রুতা বশত কেউ একজনকে ফাসানোর জন্য যে তার স্ত্রী বা ভৃত্যকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করবে না - তার কি নিশ্চয়তা ? সেক্ষেত্রে একজন নিরপরাধী প্রান হারাবে বা ‘অপবাদ’ আরোপের জন্য ৮০ বেত খাবে। উল্লেখ্য ব্যভিচারের ক্ষেত্রে মিথ্যা সাক্ষ্য দানের শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত। এত কঠিন শর্ত দেয়ার কারন একটিই । তা হল এই আইনের অপপ্রয়োগ বন্ধ করা।

নারীর সাক্ষ্য বাদ দেয়ার ভিত্তি যে কোরান/হাদীস নয় তার সমর্থন তো দ্বিতীয় পয়েন্ট থেকেই আসে। তবে নারীদেরকে তারা স্বল্প বুদ্ধির মনে করতেন কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে। এটা সম্ভবত ঐ লেখকের নিজস্ব মত। কারন ইমাম আবু হানীফা বিচারক হিসেবে নারীর অনুমোদনকে সমর্থন দিয়েছেন। সমস্ত ইমামরাই হাদীস গ্রহনের ক্ষেত্রে নারী/পুরুষের মধ্যে বাছ বিচার করেন নি।

উপরোক্ত লেখকের বাকী অংশ:

Here is more, from "CRIMINAL LAW IN ISLAM AND THE MUSLIM WORLD" published by Institute of Objective Studies, New Delhi. I am mostly quoting from its chapter- "TEXT OF PAKISTAN'S HUDUD ORDINANCES" to show that these are not outdated obsolit but currently alive laws.
PAGE 445: - PROOF OF ZINA (adultery) OR ZINA BI'L JABR (rape) LIABLE TO HADD (God's punishment) SHALL BE IN ONE OF THE FOLLOWING FORMS, NAMELY: -

(1.Either confession of the accused), OR, 2. AT LEAST FOUR MUSLIM-ADULT MALE WITNESSES……… GIVE EVIDENCE AS EYEWITNESSES.

Pages- 251: -THERE IS A TOTAL AGREEMENT AMONGST THE JURISTS ON THE NUMBER OF WITNESSES AND THEIR SEX. WOMEN'S TESTIMONY IS NOT ACCEPTED IN CASES OF ADULTERY OR IN ANY CAPITAL OFFENCE.

আমার উত্তর ঃ

না, আমরা জানি যে নারীর সাক্ষ্য বাদ দেয়ার ব্যপারটি সমস্ত ইমাম কতৃক স্বীকৃত নয়। আতা বিন আবি রাবাহ এবং ইমাম ইবনে হাজমের মত বড় ইমামরাও একক ভাবে নারীর সাক্ষ্য অনুমোদন করেছেন (যদিও দুজন নারীর সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সমকক্ষ বলে মনে করতেন)। আর হাসান বসরী সহ আরো অন্যান্য আলেমরা পুরুষের সাথে নারীর সাক্ষ্য নিয়েছেন। সুতরাং এই আইনের উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই দাবী করা ঠিক নয় ।

এই তো হল classical ইমামদের মত। এখনকার ফিকাহ্‌বিদরাও একক ভাবে নারীর সাক্ষ্য গ্রহন করছেন । প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ জামাল বাদুই সহ অনেকেই নারীর সাক্ষ্য এবং পুরুষের সাক্ষ্যের মধ্যে সংখ্যা বা অন্য কোনো তারতম্য করেন নি (শাহ আবদুল হান্নানের কাছ থেকে প্রাপ্ত এক মেইলের সূত্রে)।

লেখকের কথা:

How these laws affect human lives? In Sharia there are many laws to destroy human lives. Here I will deal with only one as a sample. For rape, the proof has to be eyewitness of four adult male Muslims. That is impossible.

আমার উত্তর ঃ

হ্যা। হুদুদের মাধ্যমে প্রমানের জন্য অবশ্যই চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য প্রয়োজন । কিন্তু এর বিচার তাজির কোর্টে হলে তার প্রমান পদ্ধতি হবে সম্পূর্ন অন্যরকম। এমন কি কোনো সাক্ষী না থাকলেও শুধুমাত্র পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য (circumstantial evidence) দ্বারা প্রমান হতে পারে। কি শাস্তি দেয়া হবে তা ঐ দেশের আইনের উপর নির্ভর করে। যেমন, পাকিস্তানে শাস্তি ২৫ বছরের সশ্রম কারাদন্ড (শাহ আবদুল হান্নানের কাছ থেকে প্রাপ্ত এক মেইলের সূত্রে)।

লেখকের কথা:

So, what really happens? Either by pregnancy or by confession to lodge a complaint with police, the raped women, either married or not, are often PROVEN

of having illicit sex. The case is impossible to prove as "Rape" for the want of Four Male Adult Muslims. Unbelievable it may seem, but in the eye of Sharia the raped women automatically assume the guilt of having adultery or fornication.

আমার উত্তর ঃ

অসম্ভব। স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্য ছাড়া কোনো অবস্থাতেই ব্যভিচার প্রমান হয় না। কোনো দেশের জুডিশিয়াল সিস্টেমে যদি sexual harassment এর বিরুদ্ধে কোনো আইন না থাকে তবে তা অবশ্যই নিন্দনীয়। আর এমন যদি হয় যে আইন forced adultery আর voluntery adultery এর মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে তবে সেই আইনের বিরুদ্ধে সবারই সোচ্চার হওয়া উচিত। কিন্তু একে শরীয়ার মুখপত্র বলে চিহ্নিত করা চরম অন্যায়। শরীয়ার প্রতি এতো সুস্পষ্ট অপবাদ।

মোট কথা, শরীয়া ভিত্তিক আইন প্রনয়ন যুগের দাবীর সাথে মানানসই হতে হবে। সপ্তম শতকের মুখস্ত করা আইন গুলো চোখ কান বুজে তোতা পাখির মত উগরে দেয়া কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বরং অনেক ক্ষেত্রেই ওগুলো যুগের প্রয়োজনকে মেটাতে পারবে না। যা শুধু বিরোধীদের হাতকেই শক্তিশালী করবে না বরং শরীয়াপন্থীরাও জালিম হিসেবে চিহ্নিত হবে।

আরো উদাহরন দিচ্ছি। আমরা জানি তালাকের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার দেয়া ফতোয়া গুলো বেশ শক্ত। সেক্ষেত্রে অন্য সমস্ত ইমামদের মতামত মিলিয়ে সবার কাছে গ্রহন যোগ্য ও সুবিধাজনক আইন নেয়া যেতে পারে। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে হানাফী ফিকাহ অনুসরন করছি বলে তালাকের ক্ষেত্রেও করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। প্রয়োজনে নূতন করে ইজতিহাদ করতে হবে।

শরীয়াকে জনগনের জন্য কল্যানকর করে তোলাই রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব। শরীয়ার আইনের অপপ্রয়োগ যাতে না হয় সে দিকে খেয়াল দিতে হবে । এক্ষেত্রে উমর বিন আব্দুল আযীযের ঘোষনা লক্ষ্যনীয় ঃ তিনি কর্মচারীদের কঠোর নির্দেশ দিয়ে লিখেন, 'আমাকে জিজ্ঞেস না করে কাউকে হত্যা করবে না বা কারো হাত কাটবে না।'

সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে বহুদলীয় গনতন্ত্র, জনকল্যান ও আল্লাহর আইনের বাস্তবায়ন। ইসলামী আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় যাতে এটি সম্পূর্ন জনকল্যানে নিবেদিত হয়। এ ব্যাপারে মওদূদী বলেন ঃ

> *ইসলামী ফৌজদারী দন্ডবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমসাময়িক অবস্থা এবং অভিযুক্তদের অবস্থাও বিবেচনা করতে হয়। যুদ্ধের সময় দন্ডবিধির কার্যকারিতা স্থগিত রাখা হয়। দুর্ভিক্ষের সময় চোরের হাত কাটা হয় না।*
>
> *আল্লামা ইবনে কাইয়েম রাসুল (সা) এর হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও কার্যক্রম থেকে বহু সংখ্যক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে একথা প্রমান করেছেন যে, বিভিন্ন ঘটনায় ইসলামের বিধান চক্ষু বন্ধ করে প্রয়োগ করা চলে না। বরং সেজন্য স্থান, কাল ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত অবস্থা ও অন্য বহু রকমের জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী।*

প্রচলিত গনতন্ত্রের বহু সীমাবদ্ধতা আছে। রাজনীতিবিদরা যে অসৎ চরিত্র আর মিথ্যাবাদী সে তো সবাই জানে। নামে গনতন্ত্র হলেও তা হয়ে যায় আসলে লবির কাছে বন্দী। কাগজে কলমে মত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করা হলেও এর বাস্তব প্রতিফলন কখনই হয় না (ই-মেলাতে জাকারিয়া স্বপনের 'ল্যান্ড অফ ফ্রীডম ল্যান্ড অফ হিপোক্রেসী' দ্রষ্টব্য)। ইসলামী খিলাফত পদ্ধতি গুনে মানে এর বহু উর্দ্ধে ।

তবে এটাও সত্য যে খিলাফাত কায়েম করা ও তাকে ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন। যার পরিনতিতে আল্লাহর রাসুল (সা) এর ওফাতের পরে মাত্র ত্রিশ বছরের মাথায় এ ব্যবস্থার পতন ঘটে। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। অরাজকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ।

খিলাফাত কায়েম করার পূর্বশর্ত হচ্ছে দুর্নীতি মুক্ত সমাজ ব্যবস্থার কায়েম। এর মাধ্যমেই কেবল আল্লাহর আইনের যথাযথ প্রয়োগ আশা করা যায়। না হলে অপপ্রয়োগের আশংকা থেকেই যায়।

এই সব কারনেই আমি ব্যক্তিগত ভাবে গনতন্ত্রের সমর্থক ।

সবাইকে ধন্যবাদ।

ফাহমিদা

রেফারেন্স ঃ

১। খেলাফত ও রাজতন্ত্র, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী
২। মওদূদীর পত্রাবলী, আধুনিক প্রকাশনী
৩। রাসায়েল ও মাসায়েল, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী